বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

বীর নরসিংহের পর ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন বিজয় নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার আমলে বিজয়নগরের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় উঠে। তিনি শুধু বিজয়নগর সাম্রাজ্যেরই নয়, মধ্যযুগের ইতিহাসে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকাল বিজয়নগর সাম্রাজ্য সবদিক দিয়ে গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহন করে। তার রাজত্বকাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক নতুন যুগের সূচনা করে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ তার সম্পর্কে বলেছেন - "He is one of the most distinguished and powerful Kings of Vijoyanagar, who fought with Muslims of the Deccan on equal terms and avenged the wrongs that had been done to his predecessors ".

কৃষ্ণদেব রায় যখন সিংহাসন আরোহন করেন তখন বিজয়নগর ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় নানা সমস্যায় বিদীর্ণ। অন্যদিকে বাহমনী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলেও তার শত্রুতা তখনও বন্ধ হয়নি। উপরন্তু বাহমনী উদ্‌ভূত নতুন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিজাপুর বিজয়নগরের উত্তর সীমান্তে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজয় নগরের পূর্ব প্রান্তে উড়িষ্যা রাজ্য গজপতি প্রতাপরুদ্র তার আগ্রাসী নীতি জোরদার করেন। বিজয়নগরের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই উড়িষ্যার কবলিত হয়। তার পিতার আমলে প্রাদেশিক সরকারগুলির বিদ্রোহ অবদমিত হলেও তাদের অনেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ তেলেঙ্গানা বিজয়নগরের অধীনতা অস্বীকার করে। দক্ষিণ মহীশুরের উম্বাওুরে পলিগার নামক সামন্ত শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে তার আমলেই গোয়াতে পোর্তুগিজ শক্তির উত্থান বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসন আরোহন করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে বাহমনী সুলতান মাহমুদ শাহ বিজাপুর, বিদর প্রভৃতি মুসলিম শাসিত রাজ্য গুলি কে সঙ্গে নিয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করেন। মুসলিম সম্মিলিত বাহিনী 'দোনি' নামক স্থানে বিজয়নগর বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে মুসলিম যৌথবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধের স্বয়ং মাহমুদ শাহ আহত হন। বাহমনী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন হলে কৃষ্ণদেব রায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কোবেলকোন্ডার যুদ্ধে মুসলিম যৌথবাহিনী পুনরায় পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিল শাহ নিহত হন। আদিল শাহ এর মৃত্যুতে বিজাপুরের চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কৃষ্ণদেব রায় এই সুযোগে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে রাইচুর দখল করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুর এই অঞ্চলটি পুনর্দখলের চেষ্টা করলে কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের 'বারিদ-ই-মামলিক' ও তার মিত্রদের প্রভাবিত করে বিজাপুরের বিখ্যাত দুর্গ 'গুলবর্গা' দখল করেন। একাধিক বৈদেশিক বিবরণ অনুযায়ী কৃষ্ণদেব এই দুর্গটি ধূলিসাৎ করেন। তার এই ধারাবাহিক মুসলিম বিজয় সত্ত্বেও মাহমুদ শাহ বাহমনী রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন। ডক্টর. এন. বেঙ্কটরামানাইয়ার মতে- কৃষ্ণ দেবের পুনঃ পুনঃ বাহমনী অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাহমনীর গুরুত্ব বাড়িয়ে বিজাপুর, বিদর, গোলকুন্ডার মত নবগঠিত মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। তার ধারণা ছিল এর ফলে তিনি রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করবেন।

কৃষ্ণদেব এই সময়ে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা গণপতি প্রতাপ রুদ্রদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ গজপতি বিজয়নগরের উদয়গিরি ও কোন্ডভিডু নামে দুটি রাজ্য ইতিপূর্বে দখল করেছিলেন, যা কৃষ্ণদেব রায়ের পূর্বপুরুষ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণদেব প্রথম পর্যায়ে উদয়গিরি উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কোন্ডভিডুতে অভিযান করেন। এই অভিযানকালে প্রতাপ রুদ্রদেব গোলকুণ্ডা ও বিদরের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও কৃষ্ণদেব কন্দপুর,বিনুকোন্ডু প্রভৃতি অঞ্চল গুলি থেকে উড়িষ্যা বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে বেজ ওয়াদা, বেঙ্গী ও তেলেঙ্গানার কিছু অংশ কৃষ্ণদেব নিজ অধিকার আনেন। কিন্তু গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়েও কৃষ্ণদেবের অধীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন কৃষ্ণ দেব উড়িষ্যার রাজধানী কটক আক্রমণ করেন এবং গজপতি পরাজিত হয়ে নিজ কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণ দেবের বিবাহ দিয়ে এক সন্ধি স্থাপন করেন। গজপতি হঠাৎ কেন সন্ধি করতে বাধ্য হন সে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। ন্যুনিজ - এর মতে - বীরভদ্র এইসময় বিজয়নগরে বন্দি অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। আবার আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন গজপতি শত্রুদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে কৃষ্ণদেব গজপতি কে কৃষ্ণা নদীর উত্তরের উপকূল ভাগ ছেড়ে দেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য যুগে ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ এক বুদ্ধিদীপ্ত সামরিক যুদ্ধের অবসান ঘটে।

কৃষ্ণদেবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চরম বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসময় পর্তুগিজরা গোয়া দখল করে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে তাদের নেতা আলবুকার্ক এর সঙ্গে এক সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। এমনকি, কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে একটি পর্তুগিজ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু Dr. C.V. Vaidya তাঁর' Downfall of Hindu India ' গ্রন্থে বলেছেন যে- পর্তুগীজদের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন বাণিজ্যের সুযোগ দিয়ে বিজয়নগরের রাজারা ভুল করেছিলেন। পর্তুগিজ পর্যটক পায়েস কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যবহারের ও শাসন দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

কৃষ্ণদেব রায় শাসক হিসেবে ও দক্ষতার পরিচয় দেন এবং প্রজাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পান। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সবসময় তৎপর থাকতেন। তিনি শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য সমগ্র দেশে প্রতিবছর পরিভ্রমণ করতেন। কৃষ্ণদেব রায় তার রাজ্যকে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি সামন্ত শক্তির প্রভাব খর্ব করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ান। প্রধানমন্ত্রী বা মহা প্রধান ছিলেন রাজার বিশ্বাস ভাজন লোক। প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রধান নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রাদেশিক শাসকরা তালুক থেকে খাজনা আদায় করে রাজকোষে জমা দিত।

কৃষ্ণদেব রায় শুধুমাত্র একজন সুশাসকই ছিলেন না, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক একজনসহ শাসক। রাজ্য শাসনের প্রশ্নে তার মূল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ। কৃষ্ণদেব ছিলেন সাহিত্যের সুপণ্ডিত। তার নিজের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'জাম্ববতী কল্যানম'। তেলেগু ভাষায় লিখিত রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'আমুক্ত

মাল্যদা '। তার রাজসভায় আর্জন দিকগজ পন্ডিত ছিলেন। এদের বলা হত 'অষ্টদিগগজ'। তিনি নিজে বৈষ্ণব ধর্মাবলি হলেও সব ধর্মের প্রতি তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কৃষ্ণদেব রায় স্থাপত্যকলার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আমলে বিখ্যাত মন্দির স্থাপত্য গুলি ছিল কৃষ্ণ স্বামী মন্দির, হাজার রাম মন্দির, বিটল স্বামী মন্দির ইত্যাদি। তিনি বিজয়নগরের নিকটে এক বিরাট জলসেচের হ্রদ খোদাই করেন। বিবাহ করের মত অত্যাচারমূলক কতগুলি কর তিনি তুলে দেন। অনাবাদি জঙ্গল পরিষ্কার করে তিনি চাষের আওতায় আনেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত এই শাসকের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ কৃষ্ণদেব রায় কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে মন্তব্য করেছেন -" দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমান শাসকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যাকে কৃষ্ণদেব রায়েরসঙ্গেতুলনাকরাযেতেপারে"।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--
1) কৃষ্ণদেব রায় কে ছিলেন ?
2) কৃষ্ণদেব রায়ের কৃতিত্ব লেখ।
3) কৃষ্ণদেব রায় তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলির কিভাবে সমাধান করেছিলেন ?
4) কৃষ্ণদেব রায়ের সাংস্কৃতিক মনোভাব ব্যক্ত কর।

সূত্র নির্দেশ :---
1) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ - ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) - অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি ও অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।

2) ভারতের ইতিহাস (৬০০ - ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ) - তেসলিম চৌধুরী।

3) ভারতের ইতিকথা (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ) - ড. মানস ভট্টাচার্য।